কয়লানীতি : রাষ্ট্র-ব্যবসা আঁতাতের একটি ডকুমেন্ট

মাহা মির্জা

কয়লানীতি নিয়ে বিভিন্ন মহলের আলোচনা-সমালোচনা নতুন কিছু নয়। এক দশক ধরে একটি কয়লানীতি প্রণয়নের জোর চেষ্টা চললেও, অভিযোগ আছে এতে জাতীয় স্বার্থকে বিবেচনায় না নিয়ে বরাবরই বিদেশি কোম্পানির স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। এই লেখায় এক দশক ধরে প্রস্তাবিত কয়লানীতিগুলো নিয়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ ছাড়াও খসড়া কয়লানীতি প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রাষ্ট্রের ব্যবসাবান্ধব এবং বিদেশি বিনিয়োগমুখী অবস্থান কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

কয়লানীতি ক্রনোলজি

২০০৫ সালে প্রথমবারের মতো কয়লানীতি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ইনফ্রাস্ট্রকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার (আইআইএফসি) নামক একটি সরকারি কনসালট্যান্ট প্রতিষ্ঠানকে কয়লানীতি প্রণয়ন করার দায়িত্ব দেয় সরকার। ২০০৫-এর ১ ডিসেম্বর একটি খসড়া কয়লানীতি প্রণয়ন করে আইআইএফসি। পরবর্তীতে বিএনপি সরকারের আমলে আরো চারটি সংস্করণ তৈরি করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৭-এর মার্চে কয়লানীতির ষষ্ঠ সংস্করণ এবং জুনে সপ্তম সংস্করণ জমা দেওয়া হয়। উন্মুক্ত পদ্ধতি ও কয়লা রপ্তানির বিধান রাখায় এবং জাতীয় সক্ষমতা বিকাশের কোনো সঠিক নির্দেশনা না থাকায় খসড়া কয়লানীতিগুলো বিভিন্ন মহলের সমালোচনার সম্মুখীন হয়। পরবর্তীতে বুয়েটের ভাইস চ্যান্সেলর আব্দুল মতিন পাটোয়ারীর নেতৃত্বে ২০০৮-এর জানুয়ারিতে কয়লানীতির অষ্টম সংস্করণ প্রণয়ন করা হয়। এই সংস্করণে বিদেশি বিনিয়োগ কিংবা উন্মুক্ত খনন পদ্ধতির বিরুদ্ধে স্পষ্ট নির্দেশনা না থাকলেও জাতীয় সক্ষমতার বিকাশ ও কয়লা উত্তোলনের জন্য 'কোল বাংলা' নামের একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন হোল্ডিং কোম্পানি গঠন করে সেই কোম্পানির মাধ্যমে কয়লা উত্তোলনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই খসড়া নীতিতে কয়লা রপ্তানির কোনো সুযোগ না রাখার কথাও বলা হয়। কিন্তু অভিযোগ আছে, কয়লানীতির অষ্টম সংস্করণ থেকে পরে জাতীয় সক্ষমতার বিকাশ সম্পর্কিত পরামর্শগুলো বাদ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা ম. তামিমের নেতৃত্বে কয়লানীতির নবম সংস্করণ তৈরি করা হয়। সমালোচনার মুখে এই খসড়াও গৃহীত হয়নি। ২০১০ সালে প্রকাশিত খসড়াটি এখন পর্যন্ত প্রস্তাবিত শেষ কয়লানীতি। বলা হচ্ছে, এটি নবম সংস্করণেরই একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

কয়লানীতি প্রণয়নে আইআইএফসিকে নিয়োগ দেওয়া প্রসঙ্গ

আগেই বলা হয়েছে, ২০০৫ সালে প্রথমবারের মতো কয়লানীতি তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় আইআইএফসি নামক একটি সরকারি কনসালট্যান্ট প্রতিষ্ঠানকে। এখানে উল্লেখ্য, আইআইএফসি একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। অবকাঠামো নির্মাণ এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সংযুক্ত করে তথ্যগত ও কারিগরি সেবা দেওয়াই এর কাজ।

উল্লেখ্য, বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কর্মকাণ্ডে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) ধারণাকে উৎসাহিত করে আসছে। আইআইএফসির ওয়েবসাইটে স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে যে আইআইএফসি টেলিযোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, তেল, গ্যাস, কয়লা, পরিবহন, যোগাযোগ, পানি সরবরাহ, গৃহায়ণ, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ, অর্থনৈতিক অঞ্চল, বন্দর উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে সরকারের পিপিপি বিষয়ক প্রচারণাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এ ছাড়া আইআইএফসির ক্লায়েন্টের তালিকায় আছে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মতো একাধিক প্রতিষ্ঠান, যারা বরাবরই বিভিন্ন খাতে রাষ্টীয় সক্ষমতা বিকাশের বিপক্ষেই অবস্থান নিয়েছে।

এদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আইআইএফসি দেশের বিভিন্ন খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে কাজ করে এবং কয়লার মতো জ্বালানি নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো আলাদা কোনো অভিজ্ঞতা বা এক্সপার্টিজ তাদের নেই। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করার মতো কোনো অভিজ্ঞতার ঝুলিও তাদের নেই। বরং তাদের 'ভিশন স্টেটমেন্টে' এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিদেশি বিনিয়োগ নিশ্চিত করাই তাদের লক্ষ্য। প্রফেসর আনু মুহাম্মদের মতে, কয়লার মতো একটি জাতীয় সম্পদের ক্ষেত্রে জাতীয় সক্ষমতার প্রশ্নটি সামনে না এনে আইআইএফসির মতো একটি বিদেশি বিনিয়োগমুখী প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে জাতীয় কয়লানীতি করানোর সিদ্ধান্ত থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে জাতীয় সম্পদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কৌশলগত অবস্থান পুরোপুরি বিদেশি বিনিয়োগমুখী। প্রফেসর নুরুল ইসলামের মতে, বিদেশি প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে কয়লা উত্তোলনের উদ্দেশ্যে আইআইএফসির করা খসড়া কয়লা নীতিটি মূলত 'প্রাইভেট সেক্টর কয়লা উন্নয়ন নীতি' বলে মনে হয়। তাঁর মতে, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব শুধুমাত্র লিজি বা বিদেশি কনসালট্যান্টদের ওপর ছেড়ে না দিয়ে দীর্ঘ মেয়াদকালে প্রযুক্তির পরিবেশগত প্রভাব ক্রমাগতভাবে নিরূপণের দায়িত্ব এক বা একাধিক জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যেমন– ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার অ্যান্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট (বুয়েট) বা বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে দেওয়া উচিত।

বিদেশি বিনিয়োগের ওপর অতিনির্ভরশীলতা এবং জাতীয় সক্ষমতার প্রশ্ন

আইআইএফসি প্রণীত খসড়া কয়লানীতির বিভিন্ন সংস্করণে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব, দক্ষ জনশক্তি এবং পুঁজির সংকটের কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম কয়লানীতির ভিশন স্টেটমেন্টে উল্লেখ করা আছে, বর্তমানে দেশে যে পরিমাণ কয়লার মজুদ আবিষ্কৃত হয়েছে তা দিয়ে বহু বছরের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে ঠিকই, কিন্তু প্রযুক্তি, দক্ষ জনসম্পদ ও পুঁজির স্বল্পতা কাটিয়ে উঠতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। খসড়া কয়লানীতির প্রথম সংস্করণের ৮.১ ধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, কয়লা সম্পদের সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করতে সব ধরনের দেশি ও বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগকেই উৎসাহিত করতে হবে। কয়লা সম্পদ অনুসন্ধান,

উত্তোলন, বাজারজাতকরণ এবং এই খাতের সার্বিক উন্নয়নের ব্যয়ভার বেসরকারি বিনিয়োগকারীই বহন করবে। এ ছাড়াও দেশের শেয়ারবাজারেও কয়লা খাতে বিনিয়োগকারী বিদেশি প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্তির উল্লেখ আছে এই ধারায়।

পরবর্তী কয়লানীতিগুলোতেও রাষ্ট্রের এই অবস্থানের খুব একটা পরিবর্তন দেখা যায়নি। যেমন– আইআইএফসি প্রস্তাবিত কয়লানীতির বিভিন্ন সংস্করণের এবং ২০১০ সালে প্রস্তাবিত কয়লানীতির ১.২ ধারায় 'কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কার ও উন্নয়নের নিমিত্তে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার/যৌথ বিনিয়োগকারী নিয়োগ করা' এবং 'দেশি/বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার নিমিত্ত লাইসেন্সি/লিজিকে বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা ও সুবিধাদি প্রণয়ন করা'র কথা বলা হয়েছে। ২০১০-এর কয়লানীতির ১০.০ (বিনিয়োগ) ও ১০.১ ধারায় (স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার/যৌথ বিনিয়োগকারী নির্বাচন প্রক্রিয়া) কয়লা অনুসন্ধান, উত্তোলন, বাজারজাতকরণসহ সকল ক্ষেত্রেই সরকারি ও বেসরকারি যৌথ বিনিয়োগ এবং প্রত্যক্ষ দেশি/বিদেশি বিনিয়োগকে স্বাগত জানানোর কথা বলা হয়েছে।

কয়লা তহবিলের উৎস ও তহবিল ব্যবহারের পরিকল্পনা থেকেও দেখা যায়, কয়লা অনুসন্ধান ও উত্তোলনের নিজস্ব সক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে কোনো আলাদা বাজেট বা অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদি কোনো আলাদা সুচিন্তিত পরিকল্পনা নেই। নিজস্ব সক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সেই প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় কিংবা দক্ষ লোকবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে কোনো আলোচনা নেই কয়লানীতিতে।

এখানে উল্লেখ্য, ২০১০-এ প্রস্তাবিত কয়লানীতিতে 'খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো এবং ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর'কে শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রয়োজনে কয়লা ব্যবস্থাপনার জন্য নতুন প্রতিষ্ঠান গঠনের কথাও বলা হয়েছে। অথচ ৯.০ ধারায় (প্রাতিষ্ঠানিক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন) দেখা যায়, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, আবিষ্কৃত কয়লাক্ষেত্রের কয়লা উত্তোলনের জন্য লাইসেন্সি বা লিজি নিয়োগ দেওয়া এবং 'কয়লা আবিষ্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারক' করা। অর্থাৎ এসব অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করার কথা বলা হলেও আদতে এদের কর্মকাণ্ড স্রেফ কয়লাক্ষেত্র লিজ দেওয়া এবং তা তদারকি ও ব্যবস্থাপনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার পরিকল্পনাটি পরিষ্কার।

বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন সময় দাবি করে এসেছেন যে কয়লানীতিগুলোর মাধ্যমে এদেশের কয়লা খাতকে প্রথম থেকেই বিদেশি বিনিয়োগের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল করে ফেলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কয়লানীতির বিভিন্ন সংস্করণে কয়লা সম্পদ উন্নয়নের জন্য জাতীয় সক্ষমতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কোথাও কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কয়লা উত্তোলন হবে, কী পদ্ধতিতে হবে এবং কত দিনে হবে, তার কোনো উল্লেখ নেই।

২০১০-এ প্রস্তাবিত কয়লানীতির ২১.০ ধারায় (কয়লা তহবিল) বলা হয়েছে, কয়লা তহবিলের অর্থ অনুসন্ধানমূলক কার্যক্রম, গবেষণা ও স্টাডি, মানবসম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি, কারিগরি দক্ষতা, প্রযুক্তির বিকাশ এবং সর্বোপরি কয়লা খাতের মহাপরিকল্পনার কাজে ব্যবহার করা যাবে। এ তহবিলের সম্ভাব্য উৎস হিসেবে সরকারি অনুদান এবং দাতা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে প্রাপ্ত ঋণ সাহায্যের পাশাপাশি লিজি কোম্পানি থেকে প্রাপ্ত গবেষণা ও উন্নয়ন ফির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কয়লা তহবিলের উৎস ও তহবিল ব্যবহারের পরিকল্পনা থেকেও দেখা যায়, কয়লা অনুসন্ধান ও উত্তোলনের নিজস্ব সক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে কোনো আলাদা বাজেট বা অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদি কোনো আলাদা সুচিন্তিত পরিকল্পনা নেই। নিজস্ব সক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সেই প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় কিংবা দক্ষ লোকবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে কোনো আলোচনা নেই কয়লানীতিতে। কয়লা উত্তোলনে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রকৌশলগত দক্ষতা সৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট খোলার ব্যাপারেও কোনো আলাদা তহবিলের পরিকল্পনা খসড়া কয়লানীতিতে রাখা হয়নি।

শুধু অনুসন্ধান বা উত্তোলন নয়, কয়লা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বেসরকারি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে প্রায় সব কয়লানীতিতে। ২০১০ সালের কয়লানীতির ১৫.০ ধারায় (কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন) উত্তোলিত কয়লা ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বদলে কয়লা উত্তোলনকারী লিজিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও লিজিকে সরকারি প্রতিষ্ঠানকে পাশ কাটিয়ে তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বা আইপিপির কাছেও কয়লা বিক্রির আগাম অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আবার বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কয়লা কিনতে হবে বৈদেশিক মুদ্রায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে সংগতি রেখে। প্রফেসর আনু মুহাম্মদের মতে, এ ধরনের ব্যবস্থা দেখে মনে হয়, সরকারের কাজ কেবল লিজি কর্তৃক উৎপাদিত বিদ্যুৎ ক্রয় করার নিশ্চয়তা প্রদান।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এসব কয়লানীতির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে রাষ্ট্রের তথাকথিত অক্ষমতার বিষয়টি প্রচার করা। অথচ এই অভিযোগের সপক্ষে কোনো তথ্যসমৃদ্ধ যুক্তি-প্রমাণ হাজির করা হয়নি। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কী পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন, কিংবা প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি, সে ব্যাপারেও কোনো আলোচনা নেই। মূলকথা, সক্ষমতা বৃদ্ধির কোনো বিস্তারিত আলোচনা না করে একপক্ষীয়ভাবে বিদেশি বিনিয়োগকে মহিমান্বিত করার জোর চেষ্টা লক্ষণীয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে কয়লা খাতকে দীর্ঘ মেয়াদে বিদেশি কোম্পানির হাতে ছেড়ে দেওয়াই যে রাষ্ট্রের কৌশলগত অবস্থান, ইতিমধ্যে প্রণীত কয়লানীতিগুলোর প্রতিটি ধাপেই তা লক্ষ করা গেছে।

কয়লা রপ্তানির প্রশ্ন

বিশেষজ্ঞরা বরাবরই দাবি করে আসছেন, দেশের চাহিদা পূরণ না করে গ্যাস বা কয়লার মতো গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ রপ্তানি করা যাবে না। পেট্রোবাংলার হিসাব অনুসারে, বর্তমানে দেশে গ্যাসের দৈনিক চাহিদা ২.৭ থেকে ৩ বিলিয়ন ঘনফুট, পাওয়া যাচ্ছে ২.২৮ বিলিয়ন ঘনফুট। এর সঙ্গে প্রতিবছর ১০ শতাংশ করে গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে বর্তমান গ্যাসের মজুদ ২০২২ সালের মধ্যেই শেষ হয়ে যেতে পারে বলে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, একই কথা কয়লার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে যদি কয়লা ওঠানো হয় তাহলে রপ্তানির জন্য বাড়তি কয়লা থাকার কথা নয়।

কয়লানীতির পঞ্চম সংস্করণ অনুসারে ২০২৫ পর্যন্ত দেশের অতিরিক্ত কয়লার চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছিল ৬০০ থেকে ১০০০ মিলিয়ন টন, বিপরীতে ওই সময়ে কয়লা উত্তোলনের মোট লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৬২৯ মিলিয়ন টন। এর মধ্যে ৩৩৬ মিলিয়ন টন কয়লা রপ্তানির প্রস্তাব রাখা হয়েছিল । প্রফেসর নুরুল ইসলামের মতে, ২০২৫ সাল পর্যন্ত কোনো কয়লা রপ্তানি না করে উৎপাদিত সমস্ত কয়লা দেশে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হলেও জ্বালানি ঘাটতি দেখা দিতে পারে। ২০০৮ সালে আবদুল মতিন পাটোয়ারী কমিটি প্রণীত খসড়া কয়লানীতিতে বলা হয়েছিল, জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশ হলে কয়লার প্রয়োজন হবে ৪৫০ মিলিয়ন টন; এবং এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত কয়লাক্ষেত্রগুলো ২০৩০ সালের পর দেশের কয়লার চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে না। তাই কয়লানীতিতে রপ্তানির বিধান রাখার কোনো সুযোগ নেই। অথচ এশিয়া এনার্জি কয়লাখনি থেকে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে বছরে গড়ে ১৫ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের প্রস্তাব করেছিল, যা থেকে বছরে প্রায় ১২ মিলিয়ন টন কয়লা রপ্তানির প্রস্তাব করা হয়েছিল। আইআইএফসি প্রণীত প্রতিটি খসড়ায়ই বেশ জোরালোভাবে কয়লা রপ্তানির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আইআইএফসি প্রণীত কয়লানীতির ভিশন স্টেটমেন্টে উল্লেখ আছে, দেশে যে পরিমাণ কয়লার মজুদ আছে তা বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা মেটাতে সক্ষম হবে। বরং দেশীয় বাজার সীমিত হওয়ায় কয়লা বিনিয়োগকারীরা যেন তাদের বিনিয়োগকৃত পুঁজি দ্রুত সময়ে ফেরত পায় তা নিশ্চিত করতে যথেষ্ট পরিমাণে কয়লা রপ্তানির অনুমোদন থাকতে হবে।

> এশিয়া এনার্জি কয়লাখনি থেকে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে বছরে গড়ে ১৫ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের প্রস্তাব করেছিল, যা থেকে বছরে প্রায় ১২ মিলিয়ন টন কয়লা রপ্তানির প্রস্তাব করা হয়েছিল। আইআইএফসি প্রণীত প্রতিটি খসড়ায়ই বেশ জোরালোভাবে কয়লা রপ্তানির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়াও আইআইএফসি প্রণীত খসড়া কয়লানীতির বিভিন্ন সংস্করণে 'কয়লা রপ্তানি' বিষয়ক একটি আলাদা অধ্যায়ই যুক্ত করা আছে। প্রথম সংস্করণসহ বিভিন্ন সংস্করণে স্পষ্টই উল্লেখ করা আছে, 'Investors are to be allowed to export coal in order to ensure that the coal sector is developed at a rapid pace.' অর্থাৎ কয়লা খাতের দ্রুত বিকাশের জন্যেই বিনিয়োগকারীকে কয়লা রপ্তানির সুযোগ দিতে হবে। অবশ্য এও উল্লেখ করা আছে যে দেশি কয়লার বাজার তৈরিতে লিজিকে দেশের ভেতরেও কয়লা বিক্রির চেষ্টা করতে হবে।

আইআইএফসি প্রণীত খসড়া কয়লানীতির পঞ্চম সংস্করণের ৩.৩ ধারায় (কয়লা রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ) উল্লেখ করা হয়েছে যে কয়লা উন্নয়নের প্রথম ১০ বছরে রপ্তানির অনুপাত হবে ১ঃ২ এবং এরপর হবে ১ঃ১। কয়লা উৎপাদন, স্থানীয়ভাবে বাজারজাতকরণ এবং রপ্তানির পরিমাণের ভিত্তিতে লিজি কোম্পানিকে কয়লা রপ্তানির সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। খসড়া কয়লানীতির পঞ্চম সংস্করণের ৪.১ ধারায় (কয়লা অঞ্চল) রপ্তানির জন্য কয়লা পরিবহনের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে। বছরে কমপক্ষে ১৫ মিলিয়ন টন কয়লা রপ্তানির জন্য বিদ্যমান সড়ক, রেললাইন, নদীবন্দর এবং মংলা সমুদ্রবন্দরের পর্যাপ্ত উন্নয়নের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা আছে। প্রফেসর নুরুল ইসলামের মতে, কয়লানীতিতে উল্লিখিত বছরে গড়ে ১৫ মিলিয়ন টন কয়লা রপ্তানির উপযোগী অবকাঠানো নির্মাণের এই প্রস্তাব লিজি কোম্পানিকে কয়লা রপ্তানির সুযোগ করে দেওয়ারই সহায়ক কার্যক্রম। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর ইসলাম আরো বলেন, ২০০০ সালে গ্যাস রপ্তানির প্ররোচকরা মত প্রকাশ করেছিল যে বাংলাদেশে বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রের উৎপাদিত গ্যাসের চাহিদা নেই। অথচ বিবিয়ানার উৎপাদিত গ্যাস ২০০৭ সাল থেকে বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

কয়লানীতির বিভিন্ন সংস্করণেই বলা হয়েছে, দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার সাথে সংগতি রেখে লিজিকে কয়লা উত্তোলন করতে হবে। আবার ২০১০-এ প্রস্তাবিত কয়লানীতির ৬.০ ধারায় বলা হচ্ছে, 'দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার, কয়লার দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে জনস্বার্থে প্রয়োজন না হলে কয়লা রপ্তানি করা যাবে না।' এ প্রসঙ্গে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি থেকে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, কে নির্ধারণ করবে জনস্বার্থ কিংবা জ্বালানি নিরাপত্তা? অভ্যন্তরীণ চাহিদার সাথে সংগতি রেখে কয়লা উত্তোলন করলে কেন 'জনস্বার্থে' কয়লা রপ্তানির প্রয়োজন হবে? জাতীয় কমিটির মতে, দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার সাথে সংগতি রেখে কয়লা উত্তোলন করা হলে রপ্তানির জন্য বাড়তি কয়লা থাকারই কোনো সুযোগ নেই। সে ক্ষেত্রে কয়লানীতিতে সরাসরি কয়লা রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না কেন? কেন জনস্বার্থের অজুহাতে কয়লা রপ্তানির সুযোগ রেখে দেওয়া হচ্ছে?

এটি স্পষ্ট যে বর্তমানে দেশের গ্যাস ও কয়লার সীমিত মজুদকে আমলে নিলে কয়লা রপ্তানির কোনো সুযোগ থাকে না। অথচ দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পর রপ্তানির জন্য কয়লা উদ্বৃত্ত থাকবে কি না সে বিষয়ে কোনো পর্যালোচনা নেই কয়লানীতিতে। আগামী ১০, ২০ ও ৩০ বছরে দেশের সর্বমোট জ্বালানি চাহিদা কী পরিমাণ হবে, এই সময়ে কী পরিমাণ কয়লা উত্তোলন করা হবে এবং দেশের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে উত্তোলিত কয়লা থেকে কী পরিমাণ কয়লা ব্যবহার করা হবে–এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের কোনো ব্যাখ্যা নেই কোনো কয়লানীতিতেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের সার্বিক জ্বালানি চাহিদা বিবেচনা না করে বিচ্ছিন্নভাবে কয়লানীতিতে কয়লা রপ্তানির অনুমোদন দিয়ে জ্বালানি নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে রাষ্ট্র খুব জোরালোভাবেই বিদেশি বিনিয়োগকারীদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

উন্মুক্ত পদ্ধতি প্রসঙ্গ

বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুসারে, ২০০৪ সালে বাংলাদেশে লোকসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০৭৯ জন। বর্তমানে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা হয় এমন দেশগুলোতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকসংখ্যার গড় ঘনত্ব বাংলাদেশের তুলনায় অনেক কম। যেমন–অস্ট্রেলিয়ায় ৩ জন, যুক্তরাষ্ট্রে ৩২ জন, চীনে ১৩৯ জন, জার্মানিতে ২৩৭ জন এবং ভারতে ৩৬৩ জন। বিশেষজ্ঞরা প্রথম থেকেই বলছেন, কয়লা উত্তোলনের ফলে এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে পৃথিবীর অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় এদেশের জন্য উন্মুক্ত পদ্ধতি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ২০০৫ সালে প্রকাশিত ইনডিপেনডেন্ট এক্সপার্ট কমিটির রিপোর্টেও উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের ফলে ফুলবাড়ী এলাকার কৃষি ও পরিবেশের ওপর যে ভয়ানক প্রভাব

পড়বে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, আইআইএফসি প্রণীত খসড়া কয়লানীতিতে একটি 'ফিজিবিলিটি' সমীক্ষা করার কথা বলা আছে। এই সমীক্ষার মাধ্যমে উন্মুক্ত ও ভূগর্ভস্থ– এ দুই পদ্ধতিতেই খনি পরিচালনার বিষয়ে পর্যালোচনামূলক আলোচনা থেকে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা কোন পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলিত হলে সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব সবচেয়ে কম পড়বে। কিন্তু এশিয়া এনার্জি প্রণীত ফিজিবিলিটি সমীক্ষার বিভিন্ন দিক পর্যলোচনা করলে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের ব্যাপারে আগে থেকেই একটি জোরালো অবস্থান লক্ষ করা যায়। যেমন– আইআইএফসি খসড়ার ভিশন স্টেটমেন্টেই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র ভূগর্ভস্থ প্রযুক্তিতে কয়লা উত্তোলনের সীমাবদ্ধতা থাকায় এই পদ্ধতি অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ লাভজনক নয়। তাই সর্বোচ্চ পরিমাণ কয়লা উত্তোলন নিশ্চিত করতে উন্মুক্ত পদ্ধতিই বেশি গ্রহণযোগ্য। কয়লানীতির প্রায় সব সংস্করণেই বলা হচ্ছে, গ্রহণযোগ্য খরচে, অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক পদ্ধতিতে এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ কয়লা উত্তোলনের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে খনি উন্নয়নের পরিকল্পনা করতে হবে। বলা হচ্ছে, কারিগরি ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলো আমলে নিলে লিজি কোম্পানির জন্য ভূগর্ভস্থ নয়, বরং উন্মুক্ত পদ্ধতিই সবচেয়ে বেশি লাভজনক। খসড়া কয়লানীতির পঞ্চম সংস্করণের ৫.১ ধারায় (উত্তোলন পদ্ধতি) বলা হয়েছে, সর্বোচ্চ পরিমাণ কয়লা উত্তোলনের মাধ্যমেই দীর্ঘ সময়ের জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব।

উল্লেখ্য, আইআইএফসি খসড়ায় যদিও উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের ঝুঁকি ও ক্ষতির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, এও উল্লেখ করা হয়েছে যে মাটির তলায় যে পরিমাণ কয়লার মজুদ আছে, তার বাজারমূল্যের তুলনায় কৃষি বা পরিবেশের ক্ষতি নিতান্তই সামান্য এবং কয়লার বাজারমূল্যের সঙ্গে তুলনা করলে এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের খরচও খুব বেশি নয়। আবার ২০১০-এ প্রস্তাবিত কয়লানীতিতে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যেসব ধারা আছে সেগুলো কেবলমাত্র উন্মুক্ত পদ্ধতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন–৭.২ (পানি ব্যবস্থাপনা) ও ৮.০ ধারায় (ভূমি পুনরুদ্ধার, পুনর্বাসন ও ব্যবহার) বর্ণিত বিষয়গুলো শুধুমাত্র উন্মুক্ত পদ্ধতির খননকে মাথায় রেখেই করা হয়েছে।

যেহেতু এটি স্পষ্ট যে ভূগর্ভস্থ পদ্ধতির তুলনায় উন্মুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমেই তুলনামূলক কম খরচে বেশি কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব, সে ক্ষেত্রে কয়লানীতির বিভিন্ন পর্যায়ে সর্বোচ্চ উত্তোলনকে বারবার অগ্রাধিকার দিয়ে উন্মুক্ত পদ্ধতির পক্ষেই রাষ্ট্র তার জোরালো অবস্থান জানান দিয়েছে। প্রশ্ন আসে, যেখানে উন্মুক্ত পদ্ধতির পক্ষেই রাষ্ট্রের স্পষ্ট অবস্থান, সেখানে আলাদা করে ফিজিবিলিটি সমীক্ষা করার প্রয়োজন ছিল কি না? অনেকেই তাই এই ফিজিবিলিটি সমীক্ষাকে 'আই ওয়াশ' বলে মনে করছেন।

আবার খসড়া কয়লানীতির প্রায় প্রতিটি সংস্করণেই বলা হয়েছে যে বিনিয়োগকারীকে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা বিবেচনায় নিয়ে কয়লা উত্তোলন পদ্ধতির প্রস্তাবনা প্রণয়ন করতে হবে। প্রফেসর নুরুল ইসলামের মতে, বিনিয়োগ করে বেশি মুনাফা অর্জন করা বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের স্বীকৃত দর্শন। সে ক্ষেত্রে কোনো বিনিয়োগকারীই দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা বিবেচনায় নিয়ে তাদের প্রস্তাবনা দাখিল করবে না। বরং জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়ে কৌশল নির্ধারণ করার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সরকারের নীতিনির্ধারকদের। অথচ কয়লানীতি বা ফিজিবিলিটি সমীক্ষার কোনোটিতেই কোন পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলিত হবে সে বিষয়ে কোনো নির্মোহ বিশ্লেষণের ছাপ পাওয়া যায়নি। বলাই বাহুল্য, যেহেতু এশিয়া এনার্জি ভূগর্ভস্থ নয় বরং উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনে আগ্রহী, কয়লানীতির বিভিন্ন পর্যায়ে কোনো রকমের পর্যালোচনার আগেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উন্মুক্ত পদ্ধতির উত্তোলনকে অগ্রাধিকার দেওয়া, এশিয়া এনার্জির পক্ষে নীতিনির্ধারকদের সরাসরি অবস্থানকেই স্পষ্ট করেছে।

রয়্যালটি প্রসঙ্গ

সংবিধানের ১৪৭(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্র ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদের মালিক আর 'রয়্যালটি' হচ্ছে খনি থেকে উত্তোলিত সম্পদের জন্য সরকারকে দেওয়া এক ধরনের 'বিশেষ ট্যাক্স'। মাইনিং রুলসের ৪৪ ও ৫৫ই ধারার শর্তানুসারে কয়লা, পিটসহ সব ধরনের খনিজ সম্পদের রয়্যালটি প্রদান করতে হয়।

১৯৬৭ সালের আইন অনুযায়ী এবং ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটে কয়লার রয়্যালটির হার খনিমুখে কয়লার মূল্যের ২০ শতাংশ ধার্য করা হয়েছিল। সে অনুসারে ১৯৯৪ সালের ৭ জুলাই অস্ট্রেলিয়ার মাইনিং কোম্পানি বিএমডি বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির জন্য পেট্রোবাংলার সাথে ২০ শতাংশ রয়্যালটি প্রদানের শর্তে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। অথচ এই চুক্তি স্বাক্ষরের মাত্র এক মাস ১৩ দিন পর অর্থাৎ ১৯৯৪ সালের ২০ আগস্ট বিএমডি দিনাজপুর, বগুড়া ও রংপুরে অবস্থিত প্রায় ১৪ হাজার হেক্টর ভূমি থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য বিএইচপির সাথে মাত্র ৬ শতাংশ হারে রয়্যালটি প্রদানের শর্তে আরো একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। অর্থাৎ মাত্র এক মাসের ব্যবধানে রয়্যালটির হার ২০ থেকে ৬ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়। ২০০৫ সালে প্রকাশিত ইনডিপেনডেন্ট এক্সপার্ট কমিটির রিপোর্টে স্পষ্ট করেই বলা আছে, বিএইচপির সাথে সম্পাদিত এই চুক্তি তৎকালীন বিদ্যমান আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং জাতীয় স্বার্থ বিরোধী। পরবর্তীতে অবশ্য ২০০৪ সালে প্রকাশিত গেজেটের ঘোষণায় কয়লা ও পিটের রয়্যালটির হার ভূগর্ভস্থ খনির জন্য ৫ শতাংশ এবং উন্মুক্ত খনির জন্য ৬ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়।

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। এক. মাইনিং রুলসে স্পষ্টভাবে ২০ শতাংশ রয়্যালটির উল্লেখ থাকার পরও রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরা বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে মাত্র ৬ শতাংশ হারে রয়্যালটি প্রদানের শর্তে চুক্তি করেছিলেন। দুই. এই চুক্তি স্বাক্ষরের প্রায় ১০ বছর পর মাইনিং রুলসের পরিপন্থী চুক্তিটিকে বৈধতা দিতে গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে মাইনিং রুলসেই পরিবর্তন এনে উন্মুক্ত খনির ক্ষেত্রে ২০ শতাংশের পরিবর্তে ৬ শতাংশ রয়্যালটির হার নির্ধারণ করা হয়। বলাই বাহুল্য, বিদেশি কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থের পক্ষে রাষ্ট্রের অবস্থান এখানে স্পষ্ট।

আবার অনেকেই অভিযোগ করেছেন, ২০১০ সালের আগে প্রকাশিত সব খসড়া কয়লানীতিতেই কমবেশি যা-ই হোক অন্তত রয়্যালটির হারটি নির্ধারণ করে দেওয়া হতো কিংবা রয়্যালটি নির্ধারণের একটি দিকনির্দেশনা থাকত। অথচ ২০১০ সালের খসড়ায় রয়্যালটির হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনগণের মতামত বা কারো কাছে জবাবদিহির কোনো সুযোগ নেই। এ বিষয়ে ২০১০-এ প্রস্তাবিত কয়লানীতির ১৭.০ ধারায় (কয়লার রয়্যালটি) বলা হয়েছে, 'সরকার সময়ে সময়ে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে দেশে উত্তোলিত কয়লার রয়্যালটি নির্ধারণ করবে।' অর্থাৎ সময়ে সময়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে যেকোনো সুবিধাজনক হারে রয়্যালটি পরিবর্তনের সুযোগ রেখে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও সরকার 'প্রয়োজনবোধে' প্রতিটি কয়লাখনির মাইনিং লিজ প্রদানের আগে রয়্যালটির নতুন হার নির্ধারণ করতে পারবে। এর ফলে বিভিন্ন সময়ে লিজি কোম্পানির পক্ষ থেকে রয়্যালটির হার আরো কমিয়ে আনার জন্য

রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের ওপর চাপ প্রয়োগ করার সুযোগ তৈরি হবে বলে অনেকের আশঙ্কা।

রয়্যালটি বনাম জাতীয় সক্ষমতা বিতর্ক

প্রথম থেকেই এমন ধারণার প্রচলন করা হয়েছে যে বাংলাদেশ দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তিগতভাবে পিছিয়ে থাকার কারণে বিদেশি কোম্পানির ওপর নির্ভর করেই কয়লা খাতের উন্নয়ন করতে হবে। এবং সে ক্ষেত্রে নিজস্ব সক্ষমতা না থাকায় স্বভাবতই রয়্যালটির প্রশ্নে বিদেশি বিনিয়োগকারীরাই সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে। এ ছাড়াও কয়লা উত্তোলন, পরিবহন ও ক্ষতিপূরণের বিপুল খরচ দেখিয়ে ৬ শতাংশ রয়্যালটির পক্ষে বিবিধ যুক্তি হাজির করা হয়। যেমন– দাবি করা হয়, কয়লা উত্তোলনের প্রথম স্তরেই লিজি কোম্পানিকে দীর্ঘ সময় ধরে বিপুল খরচের সম্মুখীন হতে হবে। এ ছাড়াও কয়লা উত্তোলন ও পরিবহনের জন্য যে অবকাঠামো প্রয়োজন, লিজি কোম্পানিকেই তার খরচের জোগান দিতে হবে। আরো দাবি করা হয়, অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের লোকসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে অনেক বেশি এবং সেই অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের বিশাল ব্যয়ভার বহন করতে হবে লিজি কোম্পানিকেই।

বলাই বাহুল্য যে বিভিন্ন গবেষণা ও এক্সপার্ট কমিটির রিপোর্ট বলছে, ফুলবাড়ী কয়লাখনি থেকে উত্তোলিত কয়লার বাজারমূল্য বিবেচনা করলে উত্তোলন শুরু হওয়ার প্রাথমিক ধাপেই লিজি কোম্পানির পক্ষে তার বিনিয়োগকৃত পুঁজির একটি বড় অংশ তুলে আনা সম্ভব হবে। বিভিন্ন গবেষণায় ফুলবাড়ীতে এশিয়া এনার্জির বিশাল আর্থিক মুনাফার বিষয়টি বারবার উঠে এসেছে। দ্বিতীয়ত, কয়লানীতির বিভিন্ন খসড়ায় বরাবরই আশ্বস্ত করা হয়েছে যে কয়লা উত্তোলন বা পরিবহনের জন্য যে অবকাঠামো প্রয়োজন তা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই নির্মাণ করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ এটি পরিষ্কার যে কোনোভাবেই লিজি কোম্পানিকে সড়ক বা রেল যোগাযোগের কোনো নির্মাণ ব্যয় বহন করতে হবে না। তৃতীয়ত, উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করলে ফুলবাড়ীর কৃষি, পানি ও পরিবেশের যে পরিমাণ ক্ষতি হবে, লিজি কোম্পানি থেকে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের প্যাকেজ দিয়ে কোনোভাবেই সেই ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কাজেই ক্ষতিপূরণ আর পুনর্বাসনের খরচের দোহাই দিয়ে রয়্যালটি কমিয়ে আনার এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

কয়লা লবি থেকে বরাবরই দাবি করা হয়েছে যে ৬ শতাংশ রয়্যালটি আন্তর্জাতিক মাইনিং প্র্যাকটিসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তাদের মতে, লিজি কোম্পানিকে শুধু রয়্যালটিই নয়, বরং বিশাল অঙ্কের কর্পোরেট করও পরিশোধ করতে হয়, দিতে হয় ভ্যাট ও রপ্তানি কর। এ ক্ষেত্রে কর্পোরেট কর ৪৫ শতাংশ হওয়ায় রয়্যালটির হার ৬ শতাংশের নিচে থাকাই বাঞ্ছনীয়। এ প্রসঙ্গে সুইডেন, জিম্বাবুয়ে, মেক্সিকো বা গ্রিনল্যান্ডের মতো কয়লা সম্পদে সমৃদ্ধ কিছু দেশের উদাহরণ দেওয়া হয়, যারা লিজি কোম্পানির কাছ থেকে রয়্যালটি আদায় না করে কর্পোরেট করসহ বিভিন্ন ধরনের ভ্যাট ও রপ্তানি করের মাধ্যমে রাষ্ট্রের আয় নিশ্চিত করে।

এদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলিত হলে কৃষি, পরিবেশ ও মানবসম্পদের বিশাল ক্ষতি তো হবেই, বরং সরকার রয়্যালটি বাবদ যে উপার্জন করবে তা-ও তুলনামূলকভাবে নগণ্য। যেমন– ৬ শতাংশ হারে বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক আয় ৪৫ মিলিয়ন ডলার। ৪৫ শতাংশ হারে কর্পোরেট কর ধরলে সরকার পাবে আরো ২০০ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ সর্বমোট ২৪৫ মিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় কয়লার মূল্য বিবেচনায় এশিয়া এনার্জির বার্ষিক উপার্জন হবে ৫০ হাজার মিলিয়ন ডলার। ৩০ বছরের চুক্তি অনুসারে এশিয়া এনার্জির মোট আয় দাঁড়ায় প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকা। এদিকে এশিয়া এনার্জির নিজস্ব হিসাব অনুযায়ী তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ মাত্র ৯ হাজার ১০০ কোটি টাকা।

তার পরও থেকে যাচ্ছে ফাঁকি। লিজি কোম্পানিকে উচ্চহারে কর্পোরেট কর দিতে হয়– এই যুক্তিতেই ২০০৪ সালে রয়্যালটির হার ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬ শতাংশ করা হয়েছিল। অথচ বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে সরকার বরাবরই বিদেশি বিনিয়োগকারী বা লিজি কোম্পানিকে বিভিন্ন ধরনের 'ট্যাক্স ইনসেনটিভ' বা কর অব্যাহতি দিয়ে আসছে। চুক্তি অনুসারে, এশিয়া এনার্জিকেও প্রায় ৯ বছরের ট্যাক্স হলিডে বা কর অব্যাহতি দিয়েছে সরকার। এ ছাড়াও সব রকমের কাস্টম ডিউটি ও রপ্তানি কর অব্যাহতি দেওয়ার ঘোষণাও আছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, ৪৫ শতাংশ হারে সরকারের জন্য যে ২০০ মিলিয়ন ডলার কর্পোরেট করের হিসাব দেখানো হয়েছে, কয়লা উত্তোলনের প্রথম ৯ বছর পর্যন্ত তার পুরোটা থেকেই বঞ্চিত হবে সরকার। সাম্প্রতিককালে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর ক্ষেত্রেও আমরা একই প্রবণতা দেখতে পাই। একদিকে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব/কর পাবে– এই যুক্তিতে স্থানীয় জনগণকে উচ্ছেদ করে কৃষিজমি কেড়ে নিয়ে জোন করা হচ্ছে, অন্যদিকে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে ১০ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত কর মওকুফ করে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ প্রথম এক দশক পর্যন্ত সরকারের কোনো আয় তো হচ্ছেই না, বরং বিদেশি বিনিয়োগকারী বিপুল পরিমাণ মুনাফা তুলে নিয়ে যেতে পারছে, আর মাঝখান থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে মানুষ, ধ্বংস হচ্ছে কৃষি।

এখানে উল্লেখ্য, কয়লা লবি থেকে অভিযোগ করা হয়, যারা ৬ শতাংশ রয়্যালটির বিরোধিতা করছে, তারা রয়্যালটির প্রশ্নে কোনো সঠিক নির্দেশনা দিতে পারেনি। এটা ঠিক যে বিদেশি বিনিয়োগকে কয়লা অনুসন্ধান ও উত্তোলনের একমাত্র উপায় হিসেবে ধরে নিলে উচ্চহারে রয়্যালটি নির্ধারণের প্রশ্নটি জাতীয় স্বার্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এখানে ভুলে গেলে চলবে না যে বাংলাদেশে জাতীয় সম্পদ রক্ষার যে আন্দোলন, তা জ্বালানি খাতে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির আন্দোলন। শুধুমাত্র রয়্যালটি বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব আয় বাড়ানো এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়। তেল, গ্যাস বা কয়লা উৎপাদনকারী অন্য সব দেশেই রয়্যালটির হার ৫-৬ শতাংশ হওয়ায় বাংলাদেশেও এই হার গ্রহণযোগ্য– এই যুক্তির বিপরীতে আন্তর্জাতিক মাইনিং প্র্যাকটিসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ একটি রয়্যালটির হার প্রস্তাব করতে পারলেই কি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদের ওপর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়? সে ক্ষেত্রে জাতীয় সক্ষমতার প্রশ্নটি উহ্য রেখে আলাদা করে রয়্যালটির হার কত হবে– এই আলোচনা জ্বালানি খাতের প্রকৃত উন্নয়নকে কেবল দিগ্‌ভ্রষ্ট করবে। বরং জাতীয় সক্ষমতা বিকাশের কোনো বিকল্প নেই– এই সূত্র ধরেই বিস্তারিত আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে।

এখানে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে কয়লানীতিগুলোর মাধ্যমে খুব পরিকল্পিতভাবে কয়লা খাতকে বিদেশি বিনিয়োগের ওপর নির্ভরশীল করে ফেলা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, কয়লা অনুসন্ধান ও উত্তোলনের নিজস্ব সক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে কোনো আলাদা বাজেট বা অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা দেখা যায় না। স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদি কোনো আলাদা সুচিন্তিত পরিকল্পনা নেই। অথচ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে কয়লা অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারলেই বিদেশি কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজন থাকে না। ক্ষেত্রবিশেষে লিজি কোম্পানির সঙ্গে রাষ্ট্রের দরদামের সুযোগও বিস্তৃত হয়।

উল্লেখ্য, পৃথিবীজুড়েই বহুজাতিক কোম্পানির মাধ্যমে জ্বালানি সম্পদ উত্তোলনের ইতিহাস শোষণমূলক ও রক্তাক্ত। নাইজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা,

গিনি বা কঙ্গোর মতো জ্বালানি সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলোতে সরকার ও বহুজাতিক তেল কোম্পানিগুলো একসঙ্গে লুটপাট চালিয়ে আসছে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে। নাইজেরিয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়, 'দে ড্রিল অ্যান্ড দে কিল ইন নাইজেরিয়া।' এসব দেশে বিদেশি কোম্পানির মাধ্যমে তেল উত্তোলন করে দারিদ্র্য কমেনি, বরং পরিবেশ ধ্বংস হয়েছে, স্থানীয় মানুষ উচ্ছেদ হয়েছে, ক্রমাগত মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, আবার আয় বৃদ্ধির বদলে দিনে দিনে ঋণের ভারে জর্জরিত হয়েছে রাষ্ট্র। কাজেই বিশ্বজুড়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর এই শোষণমূলক মাইনিং বা ড্রিলিং প্র্যাকটিসকে মডেল হিসেবে নিয়ে বাংলাদেশেও একই পদ্ধতিতেই জ্বালানি সম্পদ উত্তোলন করতে হবে– এমন ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করতেই জাতীয় সক্ষমতা বিকাশের প্রশ্নটি বারবার সামনে আসছে।

আরো উল্লেখ্য, নিজস্ব সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেই বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। ২০০২ সাল থেকেই সরকারি প্রতিষ্ঠান বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানির মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে খনিটি পরিচালিত হয়ে আসছে। কাজেই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কয়লাখনি পরিচালনার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে পাশ কাটিয়ে একচেটিয়াভাবে বিদেশি কোম্পানিকে প্রাধান্য দেওয়ার যুক্তি কী?

ভারতের অভিজ্ঞতা

অনেকেই বাংলাদেশের কয়লা খাতের উন্নয়নে জাতীয় সক্ষমতা বিকাশের প্রশ্নে ভারতের প্রায় দুই শ বছরের বেশি সময়ের কয়লা উন্নয়নের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর পরামর্শ দিয়েছে। কয়লা উত্তোলনের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যা নিরসনে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলতার অভাবের কারণে ১৯৭৩ সালে ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় হোল্ডিং কোম্পানি 'কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড'কে কয়লা উত্তোলনের সার্বিক দায়িত্ব দেয়। এ সময় আইন করে কয়েক দফায় ভারতের বেসরকারি কয়লাখনিগুলোকে জাতীয়করণ করা হয় (কেবলমাত্র টাটা ও ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানিকে জাতীয়করণ করা হয়নি)। এটা ঠিক যে ভারতে কয়লা সম্পদ উত্তোলনে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা বিতর্কের উর্ধ্বে নয়, তবে বিদেশি বিনিয়োগ ছাড়াই সেখানে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অধীনেই কয়লা অনুসন্ধান ও উত্তোলনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে ভারতের মোট ৫৬২টি কয়লাখনির মধ্যে মাত্র ১০টি প্রাইভেট সেক্টরের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে এবং বাকি ৫৫২টি খনি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ ভারতীয় কয়লা খাতের ৯৮ শতাংশই রাষ্ট্রের অধীনে পরিচালিত। ভারতে কয়লা সম্পদ বিষয়ক একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় (মিনিস্ট্রি অব কোল অ্যান্ড মাইন) পর্যন্ত রয়েছে, যার অধীনেই কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড কয়লা উৎপাদনের সার্বিক দায়িত্ব ও তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত। প্রফেসর ইসলামের মতে, বাংলাদেশে কয়লা খাতের জাতীয় সক্ষমতার বিকাশে ভারতের কয়লা উত্তোলনের দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো সম্ভব। কাজেই শুরুতেই নানা যুক্তিতে বেসরকারি বিদেশি বিনিয়োগকারীকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সুপারিশ যুক্তিযুক্ত নয়। এ প্রসঙ্গে পাটোয়ারী কমিটির জাতীয় সক্ষমতা সম্পর্কিত পরামর্শগুলো সমর্থন করে প্রফেসর নুরুল ইসলাম বিভিন্ন সময়ে বলেছেন, দেশের স্বার্থে টেকসইভাবে কয়লা উত্তোলনের প্রয়োজনে ভারতের কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের মডেল অনুসরণ করে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানায় 'বাংলাদেশ কোল লিমিটেড' নামের সরকারি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন, এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানকে কয়লা উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

পরিশেষ

কয়লানীতির বিভিন্ন অধ্যায় পর্যালোচনা করলে এটা পরিষ্কার যে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরা কয়লার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের ওপর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা বা দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বদলে বিদেশি বিনিয়োগকারী কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে। জাতীয় সক্ষমতা বিকাশের পক্ষে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শকে উপেক্ষা করে তারা বিদেশি কোম্পানিমুখী উন্নয়ন নিশ্চত করার জোর চেষ্টা চালিয়ে আসছে। কিন্তু এখানে আশার কথা এই যে প্রায় এক দশক ধরে ফুলবাড়ীর প্রতিরোধ রাষ্ট্রের এই উদ্দেশ্য হাসিলের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১০ বছর ধরে বারবার কাটাছেঁড়া করেও যে কয়লানীতির বাস্তবায়ন করা যায়নি তার প্রধান কারণ ফুলবাড়ী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা জনগণের পক্ষের শক্তির দর-কষাকষির ক্ষমতা। ফুলবাড়ী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তৈরি হওয়া প্রবল জনমতের চাপের কারণেই রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরা বারবার কয়লানীতিতে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছে এবং নিজেদের তৈরি করা কয়লানীতি বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। রাষ্ট্র ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর প্রবল আধিপত্যের বিরুদ্ধে জনগণের এই ক্ষমতায়ন সচরাচর দেখা যায় না।

গত এক দশকে এটা পরিষ্কার যে দেশি-বিদেশি ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর সঙ্গে রাষ্ট্রের এই আঁতাতমূলক সম্পর্ক ভাঙতে জনগণের প্রতিরোধের আসলে আর কোনো বিকল্প নেই। যেখানে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে, সেখানেই জাতীয় স্বার্থ বিরোধী চুক্তি বা নীতিগুলো ঠেকিয়ে রাখা গেছে। গ্যাস রপ্তানির ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি, প্রবল জনমতের চাপের কারণেই রাষ্ট্র গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু যেখানে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়নি, সেখানে দেশি-বিদেশি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী অবাধে প্রবেশ করেছে এবং জনগণের স্বার্থের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। সে কারণেই ফুলবাড়ীর প্রতিরোধ জাতীয় সম্পদ রক্ষার আন্দোলনের একটি বড় মাইলফলক হয়ে থাকবে।

মাহা মির্জা: পি.এইচ.ডি গবেষক
ইমেইল: maha.z.mirza@gmail.com

তথ্যসূত্র:

Bangladesh Coal Policy Draft, 2005. Prepared by Infrastructure Investment Facilitation Center (IIFC). December 1, 2005.

Draft Coal Policy, 2010. Published by Ministry of Power, Energy & Mineral Resources.. Government of the PeopleÕs Republic of Bangladesh. Dhaka, Bangladesh. 2010. Retrieved from www.emrd.gov.bd.

(Islam) ইসলাম, নুরুল। বাংলাদেশ কয়লা নীতি (সংস্করণ ৫.১) সম্বন্ধে মন্তব্য ও মতামত। ইনষ্টিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজী। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা। ৩০ মে, ২০০৬।

Mostafa, Kallol. Response to Farewell to FDI. Daily Star. 20 January, 2015.

Summary of the Report of the Expert Committee (REC) to Evaluate Feasibility Study Report and Scheme of Development of the Phulbari Coal Project, submitted by Messieurs Asia Energy Corporation, (Bangladesh) Pvt. Ltd. (AEC).